১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা (পর্ব-১)

আবদুল মান্নান তালিব

প্রথম পর্বঃ [১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা]

১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ

আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আসলে এটা কেবল সিপাহী বিদ্রোহ ছিল না, বরং সিপাহীদের সাথে সাথে জনগণেরও বিদ্রোহ ছিল। ভারতে ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত আক্রোশের এটাই ছিল প্রথম বিস্ফোরণ। এ বিদ্রোহে মুসলমানের সাথে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের বিরাট অংশও যোগ দেয়। তবে বাংলার হিন্দুরা ছিল ব্যতিক্রম। তারা ইংরেজের পক্ষ নেয়। ইংরেজের শাসনকে পরাধীনতার শৃংখলের পরিবর্তে তারা ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ ও কৃপা আখ্যায়িত করতে থাকে।

ইংরেজের একশো বছরের শাসন জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ও সিপাহী বিদ্রোহের বিভিন্ন কারণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় কারণটি ছিল কারতুজে শুয়োরের চর্বি ব্যবহার সম্পর্কিত গুজবটি। আর এ কারতুজ দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হতো। ফলে মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সকল সিপাহীর এতে ক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ২ জানুয়ারী দমদম থেকে এ অস্থিরতার প্রকাশ শুরু হয়। ফেব্রুয়ারীতে কোলকাতা থেকে ১৬ মাইল দূরে বারাকপুর সেনানিবাসে মংগল পাণ্ডে নামক একজন হিন্দু সৈনিক একজন ইংরেজ সার্জেন্ট মেজরের ওপর গুলী চালিয়ে এই বিদ্রোহের উদ্বোধন করে।

তারপর মীরাটে সবচেয়ে বড় সেনানিবাসে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহী বিপ্লবী সৈন্যরা দিল্লীর দিকে মার্চ করতে শুরু করে। সেখানে ছিলেন ক্ষমতাহীন শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর। সারা দেশ থেকে একই আওয়াজ ওঠে, □দিল্লী চলো□।

ইনকিলাবী সেনাদলের দিল্লীতে প্রবেশ ১৮৫৭ সালের ১১ মে থেকে বিভিন্ন দিক থেকে ছোট বড় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে স্বেচ্ছাসেবক, মুজাহিদ ও ইনকিলাবী সেনাদল দিল্লীতে প্রবেশ করতে লাগলো। তারা বাদশাহকে স্মারকলিপি পেশ করলো। তার শুরুতেই বলা হলো, □সৃষ্টি আল্লাহর, রাজ্য বাদশাহর, হুকুম কোম্পানীর।□ ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশবাসী বাদশাহের কাছে এসেছে ইনসাফের জন্য। কিন্তু বাদশাহ প্রথমে ইংরেজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাজী হয়ে গেলেন।

ইনকিলাবী সেনাদল ও মুজাহিদগণ সারা দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। যেখানে সেনাছাউনি আছে সেখানে লড়াই চলতে লাগলো। মজলুম সৈনিকরা কেবল ইংরেজ জাতিসত্তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো না, তারা ইংরেজদের প্রতিটি জিনিস ও প্রতিটি নিদর্শনকে ঘৃণা করতো। ঘৃণা ও আক্রোশের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তারা ইংরেজের প্রতিটি নিশানী খতম করে দিতে চাচ্ছিল। সেনাবাহিনীর ইংরেজ অফিসারদের খতম করে দিতে লাগলো। ইংরেজদের বসতি আক্রমণ করে ইংরেজ বাসিন্দাদের মেরে কেটে

ছারখার করে দিল। ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক আক্রমণ করে টাকা-পয়সা লুটপাট করে নিয়ে ব্যাংক জ্বালিয়ে দিল। ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত প্রেস দিল্লীর কাশ্মিরী গেটের কাছে দিল্লী গেজেটের বিল্ডিংয়ে আক্রমণ করে প্রেস জ্বালিয়ে দিল। প্রেসে কর্মরত ঈসায়ী কম্পোজিটারকেও রেহাই দিল না। তারপর ইংরেজের গীর্জার দিকে অগ্রসর হলো। ওপরে টাঙানো ক্রুশকে গুলীবিদ্ধ করলো। ঘণ্টার রশি কেটে দিল। দেয়ালের গায়ে যেসব ক্রুশ সেঁটে দেয়া হয়েছিল সেগুলো টেনে নামিয়ে খন্ড-বিখণ্ড করে দূরে নিক্ষেপ করলো।

ইনকিলাবী ফৌজের সংখ্যা দিল্লীতে পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল। চার মাস ধরে তারা বীর বিক্রমে ইংরেজের মোকাবিলা করলো। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেনাপতি বখ্‌ত খান। কিন্তু রসদ ফুরিয়ে আসছিল। সৈন্যদের বেতন দেবার সামর্থ ছিল না কর্তৃপক্ষের। সেপ্টেম্বর মাস আসতে আসতেই চারদিকে পরাজয়ের আলামত ফুটে উঠছিল। দিল্লীর ও আশাপাশের উলামায়ে কেরাম একজোটে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া দিয়েছিলেন যার ফলে বাদশাহের কোষাগারে অর্থ ও খাদ্য না থাকলেও শহরের মুসলিম জনসাধারণ ইসলামী চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুজাহিদদের আহার জুগিয়ে আসছিল। কিন্তু তাদেরও সামর্থ ফুরিয়ে আসছিল। তাছাড়া ইংরেজের ওজীফাখোর একদল অসৎ উলামার কর্মকাণ্ডও ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিল। ফলে ইংরেজ সেনাদল বিদ্রোহের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে নিজেদের শক্তি সুসংবদ্ধ করে যখন দিল্লীর ওপর চড়াও হলো তখন পরিস্থিতি পালটে যেতে থাকলো।

মীরাট থেকে শুরু

১৮৫৭ সালের ১০মে মীরাটের সশস্ত্র সৈন্যরা দেশ ও মিল্লাতের প্রতি নিজেদের গুরু দায়িত্ব অনুভব করে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিল। মীরাট ও তার আশপাশের সমগ্র এলাকার জনগণের সার্বিক সহায়তা তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র মীরাট জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল রাজধানী দিল্লীর আশপাশের মুজফফরনগর, সাহারানপুর, বুলন্দশহর, আলীগড় ও রোহিলাখণ্ড ইত্যাদি জেলায় ও শহরে। মীরাট থেকেই স্বাধীনতা সৈনিকদের বিশাল বাহিনী দিল্লীতে প্রবেশ করে দিল্লীকে ইংরেজের শাসনমুক্ত করেছিল। জেনারেল বখ্‌ত খানের নেতৃত্বাধীনে দিল্লীর জামে মসজিদে শহরের শ্রেষ্ঠ উলামা ও মুফতীগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেছিলেন।

দিল্লীর আশেপাশের এই এলাকাগুলোয় মুসলমানরা সংখ্যার দিক দিয়ে বিপুল না হলেও শিক্ষা-দীক্ষা, ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন, রাজ্য শাসন, আইন ও বিচার বিভাগ পরিচালনা এবং অন্যান্য গুণগত মানের দিক দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহ-পূর্ব বিগত আড়াইশো বছর সময় কালে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। তাই ইসলামী চেতনায় তারা ছিল অগ্রবর্তী। থানাভূন, কিরানা, কান্ধলা, শামেলী, পাহল্‌ত, খাতুলী, জাঁস্‌ট, ঝানঝানা, বুঢানা, দেওবন্দ, নানুতা, গাংগোহ, মংগলোর, রুড়কী, আম্বীঠ, রায়পুর, রামপুর মিনহারান, নুক্কুড় এই এলাকার বিখ্যাত থানা শহর।

থানভূনে উলামায়ে কেরামের জিহাদী মোর্চা চতুর্দিকে সেনা বিদ্রোহের কারণে যখন আইন-শৃংখলার চরম অবনতি দেখা দিয়েছিল এবং ইংরেজ শাসকরাও ভীতি ও আতংকের মধ্যে অবস্থান করছিল তখন সাহারানপুরের ইংরেজ কালেকটর মি. স্প্যাংকির একটি চক্রান্তমূলক পদক্ষেপের কারণে স্থানীয় উলামা ও জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। কালেকটর সাহেব বিনা দোষে থানাভূনের প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত রইসের ছোট ভাই কাজী আবদুর রহীম ও তাঁর দলবলকে সাজানো মামলায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ঘোষণা করে তড়িঘড়ি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলালো। এ ঘটনায় থানাভূন, নান্নুতা ও চারদিকের থানাগুলোর জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তাছাড়া এসব এলাকার সকল প্রতিষ্ঠিত ও মশহুর আলেমের মুরব্বী ও মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীর বাসস্থানও ছিল থানাভূন। শহীদ কাজী আবদুর রহীমের বড় ভাই কাজী ইনায়েত আলী খান এসময় জনগণের বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

এলাকার লোকদের কাছে দিল্লীর ইনকিলাব এবং স্থানীয় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। তাই পরিস্থিতি সামাল দেবার এবং করণীয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য উলামায়ে কেরামের জরুরী মজলিস শূরা আহবান করা হলো। কাজেই মওলানা মুহাম্মদ কাসেমকে আহবান করা হলো নান্নুতা থেকে।১ মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব এসময় সাহারানপুরে ছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে ডেকে আনা হলো।২ রহমতুল্লাহ কিরানভীকে দিল্লীর সঠিক অবস্থা জানার জন্য সেখানে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ফিরে এসে বৃদ্ধ বাদশাহ ও তাঁর শাহজাদাদের অনভিজ্ঞতার রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। তাঁর রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল, ইনকিলাবী ফৌজ বাদশাহর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি ও নিয়মতান্ত্রিক দলের পক্ষে তাঁদের ওপর নির্ভর করা কঠিন।

কাজেই প্রথম বৈঠকে সাইয়েদ আহমদ শহীদ প্রবর্তিত এ যাবত যে সংস্কারমূলক ও রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থাপনা চলে আসছিল তাকে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার রূপ দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবকে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার “আমীর” নির্বাচন করা হলো। মওলানা মুহাম্মদ কাসেম, মওলানা রশীদ আহমদ, হাফেজ যামেন, মওলানা মুহাম্মদ মুনীরের ন্যায় নেতৃবৃন্দকে সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা, আইন-শৃংখলা ও বিচার বিভাগ ইত্যাদি পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো।৩ এই সংগে বাদশাহর একান্ত সহচর নওয়াব শের আলী মুরাদাবাদীকে বাদশাহর কাছে পাঠানো হলো যথাযথভাবে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত রাখার এবং তাঁদের সাথে সহযোগিতা করার বার্তা দিয়ে। মওলানা মানাযির আহসান গীলানী তাঁর মওলানা মুহাম্দ কাসেমের জীবন কথার ২য় খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেবের সূত্রে একথাও লিখেছেন, “বাদশাহকে শামেলীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শের আলী সাহেবকে বাদশাহর কাছে পাঠানো হয়েছিল।” কারণ ইতিপূর্বে বাদশাহর ইনকিলাবী ফৌজকে নেতৃত্ব দান করে শাহী জুলুস সহকারে ১২ মে দিল্লী শহর পরিভ্রমণ করেছিলেন। বড় বড় বাজার খোলার ব্যবস্থা করেছিল এবং জনগনকে শান্তি ও নিরাপত্তা দানের ওয়াদা করেছিলেন। কাজেই শামেলীতে উলামা গ্রুপ যেভাবে মোর্চা গঠন করে হাজী ইমদাদুল্লাহর নেতৃত্বে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উঁচু করেছিলেন তার ফলে দিল্লী থেকে বাদশাহর নেতৃত্বে ইনকিলাবী ফৌজ এদিকে আক্রমণ পরিচালনা করলে দিল্লী থেকে নিয়ে এই পুরো এলাকাটাই ইংরেজ দখল ও শাসনমুক্ত হয়ে যেতে পারে।

> দিল্লী নিকটবর্তী মুজফফরনগর জেলার উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই জিহাদী চেতনা আচানক সৃষ্টি হয়নি, বরং তাঁরা দিল্লীতে জেনারেল বখ্‌ত খানের নেতৃত্বে ইসলামের চিরাচরিত শিক্ষা অনুযায়ী ইনকিলাবী সেনাদলের সুসংগঠিত বাহিনীর কথা শুনলেন এবং দিল্লীর জামে মসজিদের উলামায়ে কেরামের ইজতিমায় জিহাদের ফতোয়া দানের সময় তাঁদের একজন প্রতিনিধি অর্থাৎ মওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে জিহাদের চেতনা ও জিহদের জোশ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই তাঁদের মতানুযায়ী দিল্লীতে এসময় একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে উলামায়ে কেরাম ও মিল্লাতের নেতৃবৃন্দ গভীর চিন্তা-ভাবনা করে জিহাদের ফতোয়া জারী করেছিলেন।

কাজেই এখন শামেলী ও থানাভূনের জামায়াতের জন্য পথপরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এ এলাকার আমীর হাজী ইমদাদুল্লাহর ওপর দায়িত্ব এসে পড়েছিল আগামীর জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করার। কাজেই আল্লাহর বিধানঃ ওয়া শাবিরহুম ফিল আমর তথা নিজেদের বিষয়গুলো পরামর্শের ভিত্তিতে ফায়সালা করার জন্য উলামায়ে কেরামের সমাবেশ করা হলো। মূল এজেণ্ডা ছিল: জিহাদের ঘোষণা।

অর্থাৎ দিল্লীর মতই এখানেও আলোচনার একই বিষয়বস্তু ছিল- বর্তমান অবস্থায় আমরা ইংরেজের সুসংগঠিত ফৌজের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে পারি কিনা? এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কি?

শূরার আলোচনা সভায় উপস্থিত সবাই সামনে এগিয়ে যাবার পদক্ষেপ নেবার তাগাদা করেন অর্থাৎ তাঁরা দিল্লীর জিহাদের ফতোয়ার সমর্থন করেন। একমাত্র মওলানা শায়খ মুহাম্মদ থানবী দ্বিমত পোষণ করেন।

মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নান্নুতবী তাঁকে অত্যন্ত আদব সহকারে জিজ্ঞেস করেন: হযরত, আমরা বুঝতে পারলাম না আপনি কি কারণে দেশ ও দীনের দুশমন ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরয তো দূরের কথা, জায়েযও মনে করেন না?

হযরত মুহাদ্দিস মওলানা শায়খ মুহাম্মদ বলেন, এজন্য জায়েয মনে করি না যে, আমাদের কাছে যুদ্ধ করার মতো অস্ত্রশস্ত্র নেই। আমরা বলতে গেলে একেবারে খালি হাত।

মওলানা কাসেম : আমাদের কাছে কি সেই পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও নেই যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে ছিল?

শায়খ মুহাম্মদ : আপনার সমস্ত কথা মেনে নিলেও তবুও জিহাদের সবচেয়ে বড় শর্ত জিহাদের ইমাম নেই যাঁর নেতৃত্বে জিহাদ অনুষ্ঠিত হবে।

মওলানা মুহাম্মদ কাসেম: ইমাম নির্বাচন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। মুরশিদে বরহক হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন। আসুন, আমরা সবাই তাঁর হাতে জিহাদের জন্য বাইআত করি।

হাফেয যামেন সাহেব: মওলানা, ব্যস! আপনার কথা বুঝতে পেরেছি।

এরপর সবাই হযরত হাজী সাহেবের হাতে জিহাদের বাইআত করলেন অর্থাৎ প্রথমে হাজী সাহেবকে আমীর করা হয়েছিল এলাকার শাসন পরিচালনা করার জন্য। এবার তাঁর হাতে বাইআত করলেন জানমাল কুরবানী করার জন্য।

এখন প্রশ্ন ছিল: এ জিহাদী বাহিনী কোনদিকে যাবে? দিল্লীর দিকে মার্চ করাই ছিল স্বাভাবিক। কাজেই দীন ও স্বদেশভূমির এই প্রাণ উৎসর্গকারী দল জীবন বাজি রেখে একটি সুসংগঠিত শক্তির সাথে মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়লো। তাদের গন্তব্য ছিল দিল্লী। এ উদ্দেশে তারা শামেলী হয়ে দিল্লী যাবার জন্য এগিয়ে চললো। ধ্বনি উঠলো, দিল্লী চলো।৪

শামেলী হয়ে যাবার আর একটি কারণও ছিল। সেটি ছিল, শামেলীর হিন্দু জমিদার মাহার সিং ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছিল। তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল। মাহার সিং পত্রের মাধ্যমে দিল্লীর দরবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। শামেলী সে সময় সাহারানপুর জেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

জেলা ইংরেজ প্রশাসক স্প্যাংকি (Spankee) সাহেব শামেলীর অবস্থান দৃঢ় করার জন্য সেখানে গুর্খা ফৌজের একটি ব্যাটালিয়ান প্রেরণ করলো। ফৌজি কমান্ডার এডওয়ার্ড গুর্খা সৈন্যের সহায়তায় শামেলী পুরোপুরি অধিকার করে নিল। একজন বিশ্বস্ত সেনা অধিনায়ক ইবরাহীমের অধীনে সামান্য সংখ্যক সৈন্য রেখে ১৮৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নিজে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। কাজী ইনায়েত আলী সাহেব ও তাঁর সহযোগীরা এই সুযোগে শামেলী আক্রমণ করে বসলো। প্রায় একশত তের জন সৈন্য নিহত হবার পর ইবরাহীম অস্ত্র সমর্পণ করলো। এডওয়ার্ড ফিরে এলো কিন্তু ১১৩ জন্য সৈন্য ক্ষয়ের কারণে ক্রোধে ফেটে পড়লো। অন্যদিকে এ সময় মুজফ্ফর নগরের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ফলে এডওয়ার্ড সেখানে চলে গেলো। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন স্মিথ ও লেফটেন্যান্ট কিউল রুসের নেতৃত্বে শিখ ও গুর্খা বাহিনী থানাভূনে প্রেরণ করলো। মুজাহিদরা তাদেরকে চরমভাবে পরাস্ত করে ভাগিয়ে দিল। ফলে এবার পূর্ণ ইংরেজ সেনাবাহিনী পাঠনো হলো কর্ণেল ডানলপের নেতৃত্বে। তারা প্রথমে থানাভূন দখল করলো। তারপর শামেলী দখল করে তাকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করলো।৫

থানাভূনের ধ্বংসের কাহিনী ১৮৫৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাদশাহ বাহাদুর শাহ যাফর গ্রেফতার হয়ে গেলেন। দিল্লী পুরোপুরি ইংরেজের দখলে চলে এলো। বিজয়ী ইংরেজ সেনারা দিল্লীর আশপাশের এলাকাগুলো পুনর্দখল করতে শুরু করলো। কয়েক দিন পরেই সেনাদল এগিয়ে চললো থানাভূনের দিকে। একদিন রাতের অন্ধকারে ইংরেজ সেনাদলের আগমনের খবর শহরের লোকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করলো। এখন তো পরাজয় নিশ্চিত! এরপরও ইংরেজের মোকাবিলার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলো। থানা শহরের চারদিকে উঁচু দেওয়াল ছিল। তার গেটগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। ইতিপূর্বে যুদ্ধের শুরুতে ইংরেজদের কাছ থেকে একটি তোপ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। সেটি বসানো হলো একটি উঁচু স্থানে। ঘটনাক্রমে তোপের প্রথম গোলা যখন নিক্ষেপ করা হলো তা গিয়ে পড়লো শত্রুপক্ষের তোপের ঠিক মুখের ওপর। ইংরেজের একটি তোপ ধ্বংস হলো। জবাবে তাদের দিক থেকে তোপের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো একের পর এক। তাদের তোপ ছিল সাতটি। আর প্রচুর রাইফেল ও উন্নত পর্যায়ের যুদ্ধাস্ত্র। আর মুসলমানদের ছিল দোনলা বন্দুক আর কয়েকটা গাদা বন্দুক। আর ছিল গ্রামীণ হাতিয়ার অর্থাৎ তীর, ধনুক, সড়কি, বল্লম। কাজেই মোকাবিলা দু�ঘণ্টার বেশি টিকলো না। সুবহে সাদিকের সময় পূর্ব দিক থেকে থানাভূনের ওপর প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ শুরু হলো। নগর প্রাকার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো। কেরোসিন ঢেলে দিয়ে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে ফেলা হলো। যাকে সামনে পেলো তাকে হত্যা করা হলো। মূল্যবান মালসামান ইংরেজ সৈন্যরা নিজেদের ব্যাগে ভরে নিল। আর বাকি যা ছিল আশপাশের গ্রামের লোকেরা লুটপাট করে নিয়ে গেলো। থানাভূন একটি বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হলো।

কাজী ইনায়েত আলীসহ পূর্বোল্লিখিত চার নেতা কোনক্রমে ধ্বংসস্তুপ থেকে বের হয়ে জীবন রক্ষা করতে পারলেন। ইংরেজের ভাষায় থানাভূনের এই আলেম নেতৃবর্গ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে এমন কোনো অপরাধ নেই যা করেনি। তাঁরা থানাভূনে শের আলীর বাগানে হামলা করে ইংরেজ সেনাদলকে পরাজিত করে। তাদের কমান্ডারকে হত্যা করে। তোপখানা ছিনিয়ে নেয়। তারপর শামেলীর তহশীলের ওপর আক্রমণ করে সেখানে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। সরকারি ইমারত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। সরকারি জিনিসপত্র মালসামান জব্দ করে। সিপাহীদের মারপিট করে। নিজেদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। বিদ্রোহী বাদশাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা এমন কোনো অপরাধ নেই যা এই স্বাধীনতাকামীরা করেনি। তাদেরকে হাতির পদতলে পিষে মারার বা সাগর পাড়ে দেশান্তরের শাস্তি দেবার চাইতে কম এমন কোনো শাস্তি ছিল না যার অধিকারী তারা হয়নি। কিন্তু এই সমস্ত বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও তাদের প্রাণে বেঁচে যাওয়াটা অনেকটা অলৌকিক ব্যাপার মনে হতে পারে। অবশ্য পরে তাঁদের কেউ কেউ গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। কেউ কারারুদ্ধ হয়েছেন। কেউ দেশান্তরী হয়েছেন। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা

দেশান্তরী হয়েছিলেন তাঁরা দেশে ফিরে আসেন।

> ফাঁসিকাষ্ঠে তেরো হাজার আলেম পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পর ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের মুসলমানরা ইংরেজের গোলামী থেকে মুক্ত হবার জন্য তাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে। সিপাহী বিদ্রোহ ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র। আসলে শাহ অলিউল্লাহর নতুন ও বিপ্লবী ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সমগ্র উপমহাদেশে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের যে কার্যক্রম শুরু হয় এবং যাতে নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী। তারই সূত্র ধরে সারা ভারতে আলেম সমাজের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি পায়। ইসলামকে তারা উনিশ শতকের ভারতবর্ষের জাতি-বর্ণ নির্বিশেষ সকল মানুষের জন্য রাজতন্ত্রের পরিবর্তে একটি পরামর্শভিত্তিক যথার্থ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইনসাফপূর্ণ নিয়ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশে সাইয়েদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে জিহাদ আন্দোলনও শুরু হয়। কিন্তু ১৮৩৭ সালে বালাকোটের যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের শাহাদত বরণের ফলে এ আন্দোলন একটা বড় রকমের ধাক্কা খাওয়ার পর খতম হয়ে যায়নি, বরং অলিউল্লাহী চিন্তাকেন্দ্র ও আযীযী শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে অজস্র আলেম দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এই আলেমগণের জিহাদী প্রেরণাকে উজ্জীবিত করে। জিহাদ ও সংঘর্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্বত্র তাঁরা জড়িয়ে পড়েন।

কিন্তু সময় তাদের অনুকূল ছিল না। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আসা ইংরেজের কার্যক্রম, শক্তি, জ্ঞানবত্তা ও তাদের পরিচালিত ব্যবস্থা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের আরো গভীর জ্ঞান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল। বলা যায়, শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে অনেকটা অন্ধকারেই ছিলেন তাঁরা। যার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। অন্যদিকে ইংরেজ তার আসল শত্রুকে ঠিকমতো চিনতে ভুল করেনি। ফলে সারা দেশে প্রায় তেরো হাজার আলেমকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। এডওয়ার্ড টমাস দিল্লী শহরের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন : একমাত্র দিল্লী শহরে পাঁচশো শ্রেষ্ঠ আলেমকে শুলবিদ্ধ করা হয়েছিল। জল্লাদদের বাধ্য করা হতো যাতে তারা বেশি সময় পর্যন্ত লাশ শূলের ওপর টাঙিয়ে রাখে। ময়দানে প্রতিষ্ঠিত শূলদণ্ডগুলো থেকে বারবার লাশ নামানো হচ্ছিল। আর তা দেখে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজদের কলিজা ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

তথ্যসূত্র ১। সাওয়ানেহে কাসেমী, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ। ২। সাওয়ানেহে উমরী মওলানা মুহাম্মদ কাসেম, লেখক মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব। ৩। উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, ৪য় খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ। ৪। সাওয়ানেহে কাসেমী, ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃঃ। ৫। ১৮৫৭-এর মুজাহিদ, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

সূত্রঃ বদ্বীপ প্রকাশন প্রকাশিত "মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭" গ্রন্থ

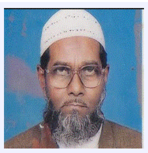
আবদুল মান্নান তালিব